বাঁশবনের ভূত

গল্প হচ্ছিল ভূতের। ভাশুরঝি নীলা ও তার স্বামী রথীন আমাদের পাড়াতেই থাকে। কোলকাতা থেকে নীলার দুই দাদা ও দু'টি বোন পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। নীলার বাবা অজয়দা জলপাইগুড়ির চা বাগানে ডাক্তার। দুই ছেলে প্রশান্ত ও সুশান্তকেও চা বাগানের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন - অবশ্য তিন জনেই আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করে। অজয়দা আমার স্বামী বিমানের পিসতুতো দাদা। বিমানও আমার মত বিহারেই বড় হয়েছে। কাজেই অজয়দার পরিবারের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না এতদিন। আমিও দিল্লীতেই প্রথম দেখলাম ওদের। কিন্তু এত মিশুক ছেলেমেয়েগুলো যে এই ক'দিনেই আপন করে নিয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ হারু, পল্টু ও ছবি তো গল্প গল্প করে ছিঁড়ে খাচ্ছে এদের। ডজন খানেক গল্প শোনা হয়ে গেছে, এখনও বক্তা বা শ্রোতা কোন তরফেই ক্লান্তির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গল্পের স্টকও যেন অফুরান - হাতী, সাপ, ডাকাতের গল্পের পর এখন ভূতের গল্প চলছে।

প্রশান্ত বলছে, "সেদিন ট্রেনটা প্রায় ঘন্টা তিনেক লেট ছিল। স্টেশনেই পৌঁছলো রাত দশটায়। মাঠ ঘাট ভেঙে মাইল চার পাঁচ হাঁটা পথে পাড়ি দিয়ে তবে গিয়ে নিজেদের গ্রামে পৌঁছবেন চক্রবর্তী মশাই। একটু ভয় করছিল বৈকি, কিন্তু উপায় নেই। বাড়িতে গিন্নী ভাত আগলে বসে আছেন তাঁর পথ চেয়ে। তাছাড়া ছোট স্টেশন, কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। সারা রাত বেঞ্চিতে শুয়ে মশার কামড় ও খিদেয় ছটফট করার চেয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরাইউচিত বিবেচনা করলেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝামাঝি। আবছা আলোয় গাছপালাগুলো বিকট মূর্তি ধরেছে। মনে মনে রাম নাম জপ করতে করতে এগুচ্ছেন চক্কোত্তি মশাই। প্রায় আধাআধি এসে পড়েছেন এমন সময় কোঁ - একটা আওয়াজ শুনে চমকে থমকে দাঁড়ালেন। ডোবার পাশে বাঁশ ঝাড় ঘেঁষে সরু একফালি

রাস্তা। সেদিকে তাকিয়ে সারা শরীরে হিম স্রোত বয়ে গেল তাঁর। একটুকু বাতাস নেই, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। অথচ বাঁশ ঝোপের একটা বাঁশ যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ভারে কিংবা আকর্ষণে নুয়ে নুয়ে পড়ছে আর আওয়াজ করছে কোঁ - কোঁ -।" হারু, পল্টু, ছবি ভয়ে আরও কাছে সরে আসে। বড়রাও নড়ে চড়ে বসে।"

প্রশান্ত বলে চলে, "চক্কোত্তি মশাই এ তল্লাটের পুরোনো বাসিন্দা। বেঁশো ভূতের কাহিনী অনেক শুনেছেন। ওঁর বুঝতে দেরী হয় না যে আজ সেই বেঁশো ভূতেরই মুখোমুখি হয়েছেন উনি। প্রথমটা খুবই ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু বিচার শক্তি হারাননি। ভেবে দেখলেন, ভূত অর নো ভূত, সামনে তাঁকে এগুতেই হবে। গাঁয়ে যাওয়ার এই একটি মাত্র পথ, ওই নুয়ে পড়া বাঁশের তলা দিয়ে। ষ্টেশনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, মাঝামাঝি পথ এসেছেন উনি। বাঁশ ঝাড় তো পথের যত্র তত্র, বেঁশো ভূত যে এই একটাই তারই বা স্থিরতা কি? তাছাড়া গিন্নী বেচারী হা পিত্যেশ করে বসে রয়েছে বাড়িতে ----। কর্তব্য স্থির করেই ধুতিটা খুলে ফেললেন, তারপর শার্ট, গেঞ্জি, আণ্ডার-ওয়্যার।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে ওঠে পল্টু, "সে কি, একদম শেম শেম?"

লীলা বোঝায়, "ভূতের সামনে আবার শেম শেম কি? বেঁশো ভূতে টিপে মারলে তখন কি শেম অর্থাৎ লজ্জা ধুয়ে জল খাবে?"

প্রশান্ত বলে, "বেঁশো ভূতের নিয়মই তাই। জামা-কাপড় খুলে ফেললে আর তাকে ছোঁবে না ওরা। তবে হ্যাঁ, সুতো-গাছটিও থাকবে না গায়ে, তবেই রক্ষে পাবে। লজ্জা পেয়েছ কি মরেছ ----। অবশ্য এ সব চক্কোত্তি মশাইয়ের ভালোভাবেই জানা ছিল। ধুতি জামা-কাপড় সব খুলে তাড়াতাড়ি একটা ছোট পুঁটলির মত বানালেন প্রথমে তারপর প্রাণপণে বলের মত ছুঁড়ে দিলেন বাঁশের ফাঁক দিয়ে। তারপর ঝুঁকে নীচু হয়ে বাঁশের তলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুঁটলিটা তুলে বগলদাবা করেই দে ছুট। দেড় ক্রোশ ছুটে বাড়ির দরজায় পৌঁছে তবে দম নিলেন তিনি। ধুতিটুতি সব পরে নিয়ে হাঁক দিয়ে তুললেন সবাইকে।"

বিমান খবরের কাগজের আড়ালে নিঃশব্দে হেসে চলেছে। তার সমস্ত শরীরটা হাসির তোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে অথচ প্রাণপণে গম্ভীর

থাকার চেষ্টা করছে সে। সবাই ভূতের গল্পে মশগুল, ওকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি, এত হাসি কিসের? ও "পরে বলবো" বলে তখনকার মত চাপা দিল।

এরপর সবাই খেতে বসলো। খাওয়া শেষ হতেই বাচ্চাদের জোর করে শুতে পাঠালাম কারণ পরদিন স্কুল আছে। আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে নীলা, তার ভাই-বোনেরা এবং জামাতা রথীন বিদায় নিলো। ওরা যেতেই বিমানকে চেপে ধরলাম।

বললাম, "এবার বলো।"

কৌতুকে চোখের কোণ কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি বলবো?"

বললাম, "ঠিকই বুঝেছ তুমি। লক্ষ্মীটি, কোন্ পেত্নীর কথা মনে করে অত হাসির হিড়িক পড়েছিল বলে ফ্যালো।"

বিমান আর ভনিতা না করে আরম্ভ করলো।

"প্রায় বিশ বছর আগের কথা। এম.এ. পরীক্ষার পর দেশে বেড়াতে গেছি। দেশের বাড়িতে থাকেন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বগলাখুড়ো। গ্রামে আমাদের যাতায়াত ছিল না বিশেষ। জ্ঞান হয়ে বোধ হয় এই প্রথম গেছি। সে বছর হঠাৎ কেন গেলাম সঠিক মনে নেই। বোধহয় গ্রাম সম্বন্ধে কৌতুহল ছিল একটা, কিংবা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি-জীবনে ঢোকার আগে একটা লম্বা ছুটির প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। যাহোক একদিন সুটকেস ও শতরঞ্চি-মোড়ানো বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে বৈঁচি স্টেশনে নামলাম আমি এবং বন্ধু সনৎ। সনৎকে তুমি দেখনি। ও যে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তাও নয়। একই হস্টেলে থাকতাম। ধনীর দুলাল, নানারকম ধনী-সুলভ নেশা বদভ্যাস ছিল যেগুলো অন্যদের সাহস বা সামর্থ্যে কুলোতো না। বয়সে বেশ কিছু বড় ছিল আমাদের থেকে। ফলে মনে মনে একটু সমীহ করতাম আমরা ওকে। আমি গ্রামে যাচ্ছি শুনেই লাফিয়ে উঠলো, আমার সঙ্গে যাবে। ওর নাকি মাছ ধরার শখ আছে। বলা বাহুল্য ওর এ শখটার কথা এই প্রথম শুনলাম আমি।

"বাবা বগলাখুড়োকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন আগেই।

বৈঁচি স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, একটা মিশকালো

দৈত্যের মত লোক এগিয়ে এলো, "বিমান দাদাবাবু নাকি?"

লোকটার চেহারা দেখে ভরসা পাচ্ছিলাম না তবু জানালাম যে এই অধমের নামই বিমান। লোকটা ছেঁড়া ফতুয়ার পকেট হাঁতড়ে একটা চিঠি বার করে হাতে দিলো। বগলাখুড়ো লিখেছেন। বাতের ব্যথাটা বেড়ে যাওয়ায় ওঁর পক্ষে স্টেশনে আসা সম্ভব হল না। পত্রবাহক নিতাইকে পাঠিয়েছেন তাই। কি আর করা যাবে। আমরা ওর হাতে বাক্স বিছানা দিয়ে ওর পিছন পিছন চললাম। মনে মনে বগলাখুড়োর উপর রাগ হচ্ছিল, এই ডাকাত মার্কা লোকটা ছাড়া আর কাউকে কি পাঠাতে পারতেন না আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে? তবু যাহোক সঙ্গে চিঠি দিয়েছেন, তা না হলে আমরা ওর সঙ্গে যেতে সাহস করতাম কিনা সন্দেহ।

"স্টেশনের বাইরে গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। জিনিসপত্র সমেত আমাদের বসিয়ে চালকের আসন নিলো নিতাই। প্রায় ঘন্টা দেড়েক মেঠো পথে অগুন্তি ঝোপ-ঝাড়-পুকুর পেরিয়ে একটা গ্রামে ঢুকলাম আমরা। বেলা পড়ে এসেছে ততক্ষণে। বাড়ির দাওয়ায় মাদুরের উপর জোড়া বালিসে ঠেসান দিয়ে বসে আছেন বগলাখুড়ো। বাড়ির ক্রিয়াকর্মে দু'একবার দেখেছি আগে। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। খুড়িমা ও ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এলো। নিতাই কোত্থেকে বালতি-ভরা জল ও ঘটি এনে রাখলো। হাত মুখ ধুয়ে মুড়কি, নাড়ু ও কলার ফলারে বসলাম।

খুড়িমা ডাক দিলেন, 'ওরে কুসুম, চা নিয়ে আয়।'

একটি অল্প-বয়সী বউ কাঁসার গ্লাসে চা দিয়ে গেল।

এতক্ষণ চায়ের তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ছিল, একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'বাঃ খুব ভাল চা হয়েছে তো!'

বউটি ফিক করে হেসে ঘাড় কাত করলো। নিতাই উঠোনে কাঠ কাটছিল। অস্ফুট স্বরে কি একটা বলতেই কুসুম সেখান থেকে সরে গেল।

"ট্রেনের ধকল কিংবা গোরুর গাড়ির ঝাকানির দরুন কিনা জানি না, ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সে কথার আভাস দিতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ওঁরা। বললেন, 'তোমরা বরং ঘরে গিয়ে একটু লম্বা হও। কুসুম, ওদের বিছানা-পত্তর পেতে দিয়ে এসে চট্‌পট্ রান্নাটা সেরে ফ্যাল।'

কুসুম লন্ঠন হাতে আমাদের আগে আগে চললো। উঠোন পেরিয়ে একটু দূরে ছোট একটা আউট হাউসের মত খাপরার বাড়ি। বাড়ি মানে একটা বড় ঘর ও দু'পাশে দু'টি ছোট ছোট খুপরী, সামনে টানা বারান্দা। মূল বাড়িটা থেকে প্রায় পনেরো বিশ গজের ফারাক। মাঝে গোটা দুই পেঁপে গাছ ও একটি লাউ না কুমড়োর মাচা মিলে আবরু রক্ষা করছে দু'বাড়িরই।

"মনে মনে বগলাখুড়োর সুবিবেচনার প্রশংসা করলাম। খুড়ো-খুড়ির স্নেহ আপ্যায়ন আন্তরিক হলেও গ্রামের প্রায় অচেনা একটি পরিবারের মধ্যে হঠাৎ উদয় হয়ে পুরোপুরি মানিয়ে নওয়া সহজ হত না। তাছাড়া এসেছি ছুটি উপভোগ করতে। খোলা-মেলা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা না হলে কি আর ছুটি জমে? এসে অবধি সনৎ কেমন যেন মিইয়েছিল, কুসুম ঘরের গোছগাছ শেষ করে লন্ঠনটা দরজার কাছে রেখে চলে যেতেই সনৎ ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো। দু'জনে সিগারেট ধরিয়ে চৌকির উপর বসলাম। সনতের ট্রান্সিস্টার সবাক হল এতক্ষণে।

"রাত্রে কুসুম কাঁসার বগী থালায় খাবার দিয়ে গেল। গরম ভাতের উপর ঘরের তৈরী গাওয়া ঘি, আলুভাজা। বাটিতে মুগের ডাল ও পোনা মাছের ঝোল।

সনৎ কুসুমের দিকে চেয়ে বললো, 'মাছ দেখছি। এখানে হাট বসে নাকি?'

জীবনে এই প্রথম গ্রামে পা দিয়েছে সে।

কুসুম কিছু বলার আগে নিতাই বলে উঠলো, 'আজ্ঞে এ আমাদের পুকুরের মাছ, আমি নিজে ধরেছি। এমন মিষ্টি মাছ কোনও হাটে পাবেন না বাবু।'

ও যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখিনি আমরা। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ হল। বারান্দায় জল গামছা রাখা ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে মশারী খাটিয়ে রেখেছে কুসুম, নিতাই মশারীর চারপাশ গুঁজে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। মন্দ লাগছিল না আমাদের। কোন তাড়াহুড়ো নেই, নেই ঘড়ি ধরা রুটিন। সকালে যত বেলা অবধি ইচ্ছে

বিছানায় গড়িমসি কর। কুসুম কিংবা নিতাই মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে যায়। জেগেছি দেখলেই চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে কুসুম। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে ধরে বড় কাঁসার গেলাস ভর্তি চা দিয়ে যায়। এক হাতে চায়ের গেলাস ও অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি ব্যস্ততা বিহীন ছুটির আমেজটুকু। জলখাবার খেয়ে দুই বন্ধু মেঠোপথ ধরে বেরিয়ে পড়ি যে কোন দিকে। সনৎ মাঝে মাঝে ওর কোলকাতা থেকে সদ্য কেনা ছিপটা সঙ্গে আনে, আমিও নিতাইয়ের দেওয়া ছিপখানা কাঁধে ফেলি। সঙ্গে ওরই সংগ্রহ করে দেওয়া নানারকম টোপ। যেদিন একটু দূরে পাড়ি দিতে চাই নিতাইকে সঙ্গে দিয়ে দেন বগলাখুড়ো, আমাদের কোন আপত্তি না শুনে। ওঁর ধারণা কোলকাতার ছেলে গ্রামে একেবারেই আনাড়ি, তাদের অভিভাবকের প্রয়োজন পদে পদে। আমরা যেমন গাঁ থেকে সদ্য শহরে আসা লোকদের প্রতি মুহূর্তে মোটর চাপা পড়ার আশঙ্কা করি এও কতকটা সেই রকমই আর কি !

"অবশ্য নিতাই সঙ্গে থাকায় সুবিধেই আমাদের। ওর ভীম আকৃতি দেখে প্রথমটা য়ে ভীতি জেগেছিল সেটা কাটতে দেরী হয়নি। লোকটা একটু নিরেট গোঁয়ার মত, তবে একান্ত অনুগত। ওরা বংশানুক্রমে আমাদের চৌধুরী পরিবারের প্রজা। চৌধুরীদের তেজ কমে এলেও গ্রাম্য সরল লোকগুলোর ভক্তি শ্রদ্ধায় ভাটা পড়েনি তখনো। বিশেষত নিতাই ও তার বউ কুসুম তখন বগলাখুড়োর সংসারের ডানহাত - যাবতীয় খাটা খাটুনি ওদের ঘাড়ে। হয়তো নিতাইয়ের স্থূলবুদ্ধিই এর জন্যে খানিকটা দায়ী। আমি বরাবর দেখে এসেছি বোকা-সোকা লোকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা অনেক বেশী সহজ - একটু চোখ কান ফুটলেই তখন তাদের মনটা সবুজতর মাঠের খোঁজে আনচান করে ----। যাহোক এসব তত্ত্ব কথা এখানে অবান্তর। যা বলছিলাম ----।

"নিতাইকে সঙ্গে করে আমরা দু'জন পুরো এলাকাটা চষে ফেললাম। লোকটার গল্পের ভাণ্ডারও অসীম। প্রতিটি বেলগাছ, অশ্বত্থগাছ, নিমগাছ, তেঁতুলগাছ, খানা, ডোবা নিয়ে এক একটা পেল্লায় গল্প ফেঁদে বসতো। সে সব গল্প আমাদের শহুরে মনের কাছে যতই গাঁজাখুরি লাগুক বাইরে যথোচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখতাম। অম্লান বদনে হজম করতাম ওর যতরকম অসম্ভাব্য অলৌকিক কাহিনী।

"'তারপর দাদাবাবু, সাতদিন ধরে এক নাগাড়ে সে কি বৃষ্টি। এদিকে মেজবাবুর বড় মেয়ের গায়ে হলুদের দিন এগিয়ে আসছে। চারদিকে থৈ থৈ করছে জল। শহরে গিয়ে শামিয়ানা, ঝাড়বাতি, বাজনদার, ভিয়েন সব কিছুর বায়না দিয়ে এসেছেন মেজবাবু কিন্তু জল না কমলে কোথায় বা ম্যারাপ বাঁধবে, কোথায়ই বা ভিয়েন বসবে আর কোথায় নহবৎখানা। মান সম্ভ্রম সব বুঝি গেল। শেষে মেজ গিন্নী হত্যে দিয়ে পড়লেন বাবার থানে - বাবা যদি দায় উদ্ধার না করেন তবে বাবার দোরেই প্রাণ দেবেন উনি ----।

"'দু'দিন দু'রাত গেল। জল তখন বৈঠক বাড়ির দাওয়া ছোঁয় ছোঁয়। বাড়ি সুদ্ধু লোকের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। বিয়ের জোগাড় মাথায় উঠেছে, এখন মেজগিন্নীর প্রাণরক্ষে হয় কি না হয় ----। শেষরাতে মেজবাবুর একটু তন্দ্রামতন এসেছে। দেখলেন সামনে বাঘছাল পরা শিবঠাকুর স্বয়ং।

চোখ পাকিয়ে বলছেন, 'ব্যাটা কাল তোর মেয়ের গায়ে হলুদ, এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস। শীগ্‌গীর ওঠ, উঠে জোগাড়-যন্তর কর্। আচ্ছা বেয়াক্কেলে বাপ যা হোক!'

তাড়া খেয়ে মেজবাবুর তন্দ্রা উড়ে গেল। চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে দেখেন চারিদিক শুকনো খট্‌খটে। কে বলবে ক'ঘন্টা আগেও এক হাঁটু জল ছিল সেখানে। হাঁক ডাক শুনে সবাই হুড়মুড় করে উঠে পড়লো। তক্ষুণি জনমজুর শামিয়ানা খাটাতে লেগে গেল। সার সার উনোন পেতে ভিয়েন বসলো, শানাইয়ের পোঁ ধরলো বাজনদার ----।

"নিতাইয়ের একটা বড় দুর্বলতা ছিল। বউ সম্পর্কে সন্দিগ্ধভাবে সতর্ক ছিল লোকটা। হয়তো নিজের চেহারা সম্বন্ধে একটা হীনমন্যতা পুষে রেখেছিল মনে মনে। ছিপছিপে সুশ্রী সাবলীল মেয়েটার পাশে সে যে একেবারে বেমানান এই বোধটাই ক্রমে উৎকন্ঠায় পরিণত হয়েছিল হয়তো। আগেই বলেছি আমাদের তত্ত্বতল্লাসের ভার ছিল ওদের উপর। খুড়ো ও খুড়িমা দু'জনেই বাতের ব্যথা, বয়স ও মেদ ভারে কাবু হয়ে পড়েছেন। দৈনিক ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, কাছে বসিয়ে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে অতিথি সৎকারের কর্তব্য পালন করতেন। বাকী সময় আমাদের সুখ সুবিধা তদারকের ভার কুসুম ও তার স্বামী নিতাইয়ের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন ওঁরা।

"কুসুমের ব্যবহারে কোন জড়তা ছিল না। হাসি খুসি চটপটে মেয়েটিকে বেশ ভাল লেগেছিল আমাদের। কিন্তু নিতাই সেটা মোটে পছন্দ করতো না। কুসুমকে আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখলেই থমথমে হয়ে উঠতো ওর মুখ। কোন না কোন কাজের অছিলায় সেখান থেকে সরিয়ে দিতো ওকে। কুসুম চলে গেলেই নিতাই সহজ হয়ে উঠতো, একান্ত অনুগত ভৃত্যের ভূমিকায় নেমে আসতো আবার। আমি প্রথম ক'দিনেই ব্যাপারটা আঁচ করেছিলাম এবং সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। কি দরকার বাবা ওদের পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে। কুসুমের সঙ্গে নিতান্ত দরকার ছাড়া কথা বলতাম না। কিন্তু সনৎ একেবারে উল্টো। নিতাই একটু তফাতে গেলেই নানারকম খুনসুটি করতো কুসুমের সঙ্গে, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার কুসুম কিছু মনে করা দূরে থাকুক আরও উসকোতো ওকে। একদিন দেখি জোর করে কুসুমের মুখে সন্দেশ পুরে দিচ্ছে। ও কিছুতেই খাবে না, সনৎও নাছোড়। বেশ খানিক হুটোপাটি জড়াজড়ি হল। দূরে নিতাইয়ের সাড়া পেতেই ছিটকে আলাদা হয়ে গেল দু'জনে।

"সেদিন আড়ালে সনৎকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

বললাম, 'দ্যাখ, ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে কেন ঝামেলা করছিস্ খামোকা। দেখেছিস্ তো লোকটার চেহারা ! কোথাকার জল শেষে কোথায় গড়াবে তার ঠিক কি?'

সনৎ হুঁ হাঁ কিছুই বললো না। সেদিন বিকেলে পাশের গাঁয়ের বড় দীঘিতে মাছ ধরার প্রোগ্রাম ছিল। নিতাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। সঙ্গে নানারকম সরঞ্জাম। কাজলা দীঘির মাছ নাকি আশে পাশের দশটা গাঁয়ে বিখ্যাত। আমরা ঠিক করেছিলাম বেশ ক'টা বড় বড় মাছ না নিয়ে নড়বো না। যত রাত হয় হোক। সঙ্গে একটা হারিকেনও আনা হয়েছে। কুসুম একরাশ খাবার বেঁধে দিয়েছে একটা পুঁটলিতে। দীঘির পাড়ে পৌঁছে একটা মনোমত জায়গা বেছে বসে পড়লাম তিনজনে।

"মাত্র মিনিট পনেরো কেটেছে, সনৎ উঠে আমার কাছে এলো। ওর নাকি শরীর খারাপ লাগছে। মাথায় ভীষণ যন্ত্রনা, পেটের মধ্যেও কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

'আমি বরং বাড়ি চলে যাই। বাক্সে ওষুধপত্তর আছে। গোটা দুয়েক বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো ----।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত তোড়জোড় করে আসা, সব পণ্ড হয়ে গেল।

আমায় ছিপ গুঁটোতে দেখে সনৎ বাধা দিলো, 'তোরা এখানেই থাক। আমি একাই যেতে পারবো।'

খানিকক্ষণ দোটানার মধ্যে থেকে শেষে ওর প্রস্তাবেই রাজী হলাম। কাজলা দীঘির রুই কাতলার লোভ ছাড়তে পারলাম না।

"হয়তো ওর সঙ্গে নিতাইকে পাঠানোউচিত ছিল। কিন্তু সন্ধ্যে হতে দেরী নেই। এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একা একটা টিমটিমে লন্ঠন সম্বল করে বসে থাকতে সাহস হল না। গত ক'হপ্তা ধরে ভূতের গল্প বলে বলে নিতাই যেভাবে ব্রেন-ওয়াশ করেছে, অন্ধকার হলেই মনে হয় আনাচে কানাচে অশরীরি আত্মারা ঘোরাফেরা করছে। বাইরে স্বীকার করি না করি, গাঁয়ের আবছা আলো ছায়া ঘেরা রাতে নানারকম অচেনা-আধচেনা শব্দ মিলে যেন একটা সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে পরিবেশে সম্ভব অসম্ভবের চুলচেরা গণ্ডীটাকে সবসময় টিকিয়ে রাখা যায় না।

"সনৎ যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। মনে মনে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল ওকে একা ছাড়ার জন্যে। বেচারা ঠিকমত পৌঁছলো কিনা কে জানে। রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে টড়ে যায়নি তো? প্রথমে ভেবেছিলাম বড় গোছের গোটা দুই রুই কাতলা পড়লেই ছিপ গুটিয়ে উঠে পড়বো। প্রায় ঘন্টা খানেক হয়ে গেল। রুই কাতলা দূরে থাক একটা চুনোপুঁটিও পড়লো না ছিপে। এদিকে সনতের জন্যে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে। শেষে 'দুত্তোর, মাছের নিকুচ করেছে' বলে উঠে পড়লাম। নিতাই ছিপ ও বাকী জিনিস-পত্তর তুলে নিলো। আমার হাতে হারিকেন।

"বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছি। আমাদের গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে গেছি আমরা। ডোবার পাশ দিয়ে সরু মেঠো রাস্তা। বাঁক ঘুরে ওপাশে আসতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়েই চকিতে মিলিয়ে গেল। আমার কয়েক পা পিছনেই নিতাই। আমার হাত থেকে জ্বলন্ত হারিকেনটা ঝপাং

করে ডোবার মধ্যে পড়ে গেল।

'কি হল দাদাবাবু?'

প্রশ্নটা পুরো করার আগেই বোধহয় উত্তর পেয়ে গেছে নিতাই।

কারণ পরক্ষণেই কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'সর্বনাশ, শীগ্‌গীর রাম নাম করুন ---- রাম রাম রাম রাম রাম ----।'

আমিও ভড়কে গিয়ে ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে শুরু করলাম 'রাম রাম রাম রাম ----।'

হঠাৎ শুনি ঝোপের ওপাশ থেকে আওয়াজ আসছে 'রাম রাম রাম রাম রাম।'

মেয়েমানুষের গলা। নিতাই সতর্ক দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকালো।

তারপর ডাকলো, 'কুসুম, অ কুসুম ----।'

"ঝোপের মধ্যে থেকে যে বেরিয়ে এলো, আধো অন্ধকারেও চিনলাম সে কুসুমই বটে। কিন্তু একি বেশ হয়েছে? শাড়িটা চাদরের মত করে কোন রকমে গা ঢাকার চেষ্টা করছে। শায়া ব্লাউজের পাত্তা নেই। দু'চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

সমানে বিড় বিড় করে চলেছে, 'রাম রাম রাম রাম।'

নিতাই আবার ডাকলো, 'অ-কুসমি, অ-বউ, এই যে আমি ----।'

এতক্ষণে যেন চিনতে পারলো কুসুম।

নিতাইয়ের হাত চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, 'অগো, আজ আর আমি বাঁচতাম না। বেঁশোয় ধরছিল মোরে ----।'

এদিক ওদিক খুঁজে কুসুমের শায়া ব্লাউজ উদ্ধার করলো নিতাই। আমি একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর জামা-কাপড় পরা হলে তিনজনে বাড়ির পথ ধরলাম। বাড়ি এসে নিতাই ও কুসুম ফলাও করে সবার কাছে বেঁশোভূতের কীর্তি বর্ণনা করতে লাগলো। আমি সটান আমাদের ঘরে চলে এলাম।

"সনৎ আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

আমি কোন ভূমিকা না করে বললাম, 'জিনিষপত্তর গুছিয়ে নে, রাত এগারোটার ট্রেনে যাচ্ছি আমরা।'

সনৎ তড়াক করে উঠে বসলো। কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে বাধা দিয়ে পকেট থেকে এমব্রয়ডারি করা শাদা রুমালটা বার করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। কুসুমের জামা-কাপড়ের পাশে ঝোপের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেটা। সনৎ রুমালটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেললো। তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে জিনিসপত্র প্যাক করতে লাগলো।"

বিমান চোখ বুঁজে সিগারেটে টান মারলো।

"তারপর কি হল?"

"তারপর আর কি? সোজা কোলকাতা চলে এলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে দু'জন দু'মুখো রওনা দিলাম। সনতের সঙ্গে এরপর আর কখনো দেখা হয়নি আমার।"

তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রহস্যময় হাসি হেসে বললো, "অতএব ম্যাডাম, ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোদের একেবারে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিও না। সময়ে অসময়ে মানুষের অনেক কাজে লাগে এরা ----।"

একটা বিষয়ে তখনও মনের মধ্যে খটকা লাগছিল।

বললাম, "কিন্তু লন্ঠনটা ডোবার মধ্যে পড়ে গেল কি করে? তার মানে তুমিও ভয় পেয়েছিলে? এ্যাদ্দিন জানতাম তোমার খুব সাহস ----।"

"রাখো তোমার লন্ঠন। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে মাথায় বুদ্ধিটা এলো! তা না হলে সেইখানেই খুন-খারাপী হয়ে যেতো ----।"

"তার মানে? সনৎ?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় নায়ক নায়িকা তড়িৎ বেগে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। লন্ঠনটা থাকলে ওদের জারিজুরি বেশীক্ষণ টিকতো না। নিতাইয়ের সেই প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারাখানা তো দেখনি। একা হাতেই সব কটাকে সাবড়াতো। এ্যাদ্দিনে হয়তো তোমার পতিদেব সেই ডোবার ধারে ভূত হয়ে লোকের ঘাড় মটকাতো আর তুমি শেষ অবধি মিহির দত্তের গলাতেই মালা দিতে ----।"

"আবার তুমি সেই সব পুরোনো কথা তুলছো? কতবার বলেছি ----।"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। শুনতে খারাপ লাগে তো আর বলবো না। অবশ্য সত্যিই শুনতে খারাপ লাগে কি না দ্যাট্স্ দ্য মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন্ ---" একরাশ ধোঁয়ার আড়ালে কৌতুকে ঝিক্মিক্ করে ওর দু'চোখ, যেন শরতের মেঘের ফাঁকে ঝলমলে সূর্য।